দেশভাগের দুটি উপন্যাস

সংকলন প্রসঙ্গে

কবি-কথাশিল্পী-প্রাবন্ধিক-গবেষক প্রয়াত আবদুল মান্নান সৈয়দ *ইছামতীর এপার-ওপার* উপন্যাসে দেশ ভাগ ও উদ্বাস্তু-জীবনের যন্ত্রণার মূল উপড়ে তুলেছেন। তিনি তুলে এনেছেন সাম্প্রদায়িকতার মর্মযাতনা। দুই বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের সূত্রে দুই কিশোর-কিশোরী, মন্টু ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রধান এই দুই চরিত্রের কৈশোরক প্রেম-বেদনা, আনন্দ, দুঃখ, ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের গভীর মর্মতল বুনেছেন কোলাজের মতো টুকরো টুকরো ছবিতে। তার সঙ্গে চলেছে অনেক চরিত্র আর ঘটনার অমোঘ প্রবাহ।

দেশ বিভাগের পটভূমিকায় বাংলা ভাষায় অনেক গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলা থেকে এ দেশে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের নিয়ে তেমন কিছুই রচিত হয়নি। আবদুল মান্নান সৈয়দের *ভাঙা নৌকা* উপন্যাসের বিষয় এমন কয়েকজন, যারা ওপার থেকে চলে এসেছিলেন ঢাকায় এবং বাংলাদেশের অন্য কয়েক জায়গায়। এদেরই জীবনের সুখ-দুঃখের গাথা এই উপন্যাস। কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বাস্তুচ্যুতির আরো গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের বিষয়ের মধ্যে যেমন নতুনত্ব আছে, তেমনি ঘটেছে কয়েকটি নারী-পুরুষের জীবনের জটিলতার আশ্চর্য রূপায়ণ।

বেঙ্গলবুকসের নিবেদন দেশভাগের পটভূমিকায় একজন বিশিষ্ট লেখকের দুটি উপন্যাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সংকলন।

ইছামতির এপার-ওপার

এক

মাঝি বলেছিল, 'সাঁঝবেলা জোয়ার আলি নৌকো ছাড়ব। ঠ্যান্ডায় ঠ্যান্ডায় পার হয়ে যাব। কোনো ভয় নেই। ত্যাতোক্ষণ জিরিয়ে নেন এট্টু।'

অপরিসর খালের ভেতর নৌকো। এপার থেকে ওপারে যেন লাফ দিয়ে পার হওয়া যাবে—এমন সরু, বিশেষ করে যেখানে ওই দুদিকের বুনো গাছপালা খালটাকে জাপটে ধরেছে দু'দিক থেকে। জোয়ারের সময় তো গাছগুলো গায়ে গায়ে লেগে যায়, এখন ভাটার সময়, একটু সরে আছে, সরে সরে আছে। ওই গাছগুলোর সত্যি কঠিন জান, নোনাপানি খেয়ে খেয়ে নোনাপানির মধ্যে যে কী করে বেঁচে আছে! মাঝিদের কাছ থেকে এটুকু তথ্য জোগাড় করেছে মন্টু।

মন্টু নৌকোর বাইরে বসে আছে, ছইয়ের কাছাকাছি, গলুইয়ের থেকে বেশ দূরে। ওর আর-ভাইবোনরা তো সেই দুপুরবেলা ছইয়ের ভেতরে সেঁধিয়েছে, আর বেরোয় না। দেশ-গাঁয়ের মানুষ বটে ওরা, কিন্তু ওদের গাঁয়ে নদী নেই। হেঁটে মাইল তিনেক এলে শহর, শহর ফুঁড়ে চলে গেছে ইছামতী নদী—নদী দেখতে ওরা দল বেঁধে গিয়েছে কখনো কখনো। নদীর ধারে, বড় রাস্তার ওপরে, সেই যে বিরাট গুদোমঘর ছিল, সেটাই তিন-চার বছর ধরে রূপান্তরিত হচ্ছে : বায়োস্কোপ দেখানো হবে নাকি ওখানে। লোকে বলাবলি করছে ফুর্তিতে : শহরের দোকানে দোকানে কলের গান হয়েছে, এখন কলের ছবিও হবে। বুড়োরা বলছে : গজব নেমে আসবে আল্লার।

—এ কী কাণ্ড! এ্যাঁ! জ্যান্ত মাগিরা ছবির ভেতরে নাচবে-

হাঁটবে। এত বড় শেরেকের কাজ কি সহ্য হয়! কী গোনা! সেই যে-বার মার্টিন রেললাইন বসেছিল, সেবার গ্রামকে-গ্রাম মড়কে উজাড় হয়ে গেল। —ওদের ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা ছিল জিনিসটা কী দেখবার। কতবার গিয়ে গিয়ে দেখে এসেছে, কী বিশাল দালান উঠছে। দেখেও সুখ। এখন, কোথায় গেল সে-সব, ফেলে এল কোন জন্মের ওপারে।

কী রকম যেন করতে থাকে, কোথায় কোন মাটির ভেতরকার শেকড়ে টান পড়ে, মন্টু থির থাকতে পারে না, উঠে দাঁড়ায়। ছইয়ের ভেতর থেকে উদ্বিগ্ন মা ডেকে বলেন, ‘কোথায় যাচ্ছিস আবার?’

মন্টু তখন পাড়ের কাদায় পা দিয়েছে, বলে, ‘এই এট্টু ঘুরে আসি,’ কাদা ভেঙে ভেঙে ডাঙায় উঠে আসে।

যে গোরুর গাড়িতে করে ওরা এসেছে, সেটা তখন বিশাল এক বটগাছের নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। গোরু দুটো ছেড়ে দিয়েছে রমজান চাচা, গাড়ির ভেতরটা শূন্য। রমজান চাচা আর দাদা এক দোকানের সামনে বাখারি দিয়ে তৈরি বেঞ্চিতে বসে গল্প করছে।

বিকেল পড়ে আসছে, রোদের রং সোনা থেকে আস্তে আস্তে ঘি-রঙের হয়ে আসছে, গাছের ছায়া আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এই তো সেই সময় যখন ‘আগান-বাগান’ ঘুরে মুরগিগুলো খাবারের লোভে এসে জুটছে ‘পোটে’র নিচে, ওপাশের বাগানে ছায়া জমছে, আর পাখিদের কাকলি বেড়ে যাচ্ছে, দাদা দুপুরবেলায় ঘুম থেকে উঠে ধীরেসুস্থে ডাবের পানি খেয়ে দহলিজে এসে বসছেন, আর একজন-দুজন করে লোক আসছে, হুঁকো তামাকটা চলছে, মেঝেয় সব বসে আছে ‘বিছেন’ পেতে, তারই মধ্যে গল্প করার, আড্ডা দেবার আনন্দ, তারই মধ্যে কাজও হচ্ছে হয়তো, ছোটখাটো বিচার, সলা-পরামর্শ, এমনকি রাগারাগিও, কিন্তু সমস্তের মধ্যেই কোথায় যেন আনন্দদ্যুতি জ্বলছে।

দুই

মন্টু শুতে যাচ্ছিল।

আম্মা বললেন, 'মন্টু, রাত্রিবেলা ডাকলিই সাথে সাথে উঠে পড়বে, বাবা! দেরি কোরো না।'

মন্টু বিছানায় তক্তপোশের ওপর ঘুমোতে যাচ্ছিল। ওদের আম্মাও ওই তক্তপোশে শোন ওদের সঙ্গে।

কথা শুনে একটুখানি তাকাল মন্টু চারদিকে। তারপর বলল, 'আচ্ছা।'

তাকানোর কারণ, মা'র গলার স্বর অন্য রকম শোনাল : কী রকম ভয় আর উদ্বেগে ভরা, কিন্তু দৃঢ়তায়ও। তা ছাড়া মন্টু খেয়াল করেনি। অন্য সময় তার মা তাকে 'তুই' বলেন, এখন 'তুমি' সম্বোধন করলেন। সময় কি সম্বোধনের ভাষাও পাল্টে ফেলে? আম্মাকে হঠাৎ একই সঙ্গে খুব দূরের আর খুব কাছের মনে হলো।

ছেঁড়া আর পুরোনো শাড়ি দিয়ে ছোটখাটো একটা পুঁটলি বাঁধছিলেন আম্মা। সে পুঁটলির ভেতর দরকারি কতকগুলো জিনিসপত্র রাখছিলেন। মন্টুর বড় বোন ফিরোজা, যাকে মা 'ফিরু' বলে ডাকে, আর মন্টু-টুটুরা বলে 'বু', এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে মাকে সাহায্য করছিল। কেউ কোনো কথা বলছিল না, প্রায় নিঃশব্দেই এই সব কাজ চলে। ঘরের এক কোনায় হলদে হারিকেন জ্বলে যায়। দরোজা-জানালা সব আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ। বাইরে অন্যদিন অফুরান ঝিঁঝির আওয়াজ বেজে যায়। আজ যেন ঝিঁঝিরাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকার থম্ ধরে আছে। রান্নাঘরে মোড়ায় বসে যেসব গাছ-ঝোলা গলা-কাঁটা ভূতের গল্প বলেন রশি মামা, সেই সব ভয়াল ভূত যেন ওত পেতে আছে বাইরে; সারা গ্রামটাই নিথর।

কদিন থেকেই রাত্রিগুলো ভয়ে ভয়ে কাটছে ওদের। মন্টু বোঝে না ব্যাপারটা ঠিকমতো, সে জন্যেই এক অন্ধ ভয়ে ভেতরটা সিঁটিয়ে থাকে। কদিন থেকেই সন্ধে হতে-না-হতেই

সারা গ্রাম নিদ্রার মতো নিথর হয়ে যায়, আঁধার নেমে আসে ভূতের মতো, আর রোজ রাত্রিবেলা এক বিচিত্র অদ্ভুত শব্দের কি নৈঃশব্দ্যের আতঙ্কে ওরা জেগে ওঠে। কখনো এক বিচিত্র ‘হরি-বোল’ শব্দের যৌথ উচ্চারণ, কখনো এক অদ্ভুত ‘আল্লাহো-আকবর’ ধ্বনিতে এক নামহীন ভয় নেমে আসে যেন দলবদ্ধ হয়ে। তার সঙ্গে অনেক কণ্ঠের কোলাহল—অস্পষ্ট, বিমিশ্র, ভয়াবহ। এই তো সেদিন ভেতরের দাওয়ায় গিয়ে দেখে, উত্তরে, চাষিদের পাড়ার আকাশে আগুনের হলকা। কদিন আগে গ্রামের বড় বাড়ির, ওদেরই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে, পিঠে ছোরা-বেঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। দাদা কয়দিন থেকে আর পাড়ার মসজিদে যাচ্ছেন না, বাড়িতেই নামাজ পড়ে নিচ্ছেন।

মন্টু শুয়ে শুয়ে আম্মার বাঁধাছাঁদা দেখছিল। আম্মা বলে দিয়েছেন রাতে ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে। আম্মা ডাকলেই ওরা ওই পুঁটলি নিয়ে ওদিকের বাগানের ভেতরে চলে যাবে, ওখানে আছে এক মস্ত ‘খানা’, তার ওপারে চাষিদের বিস্তৃত ধানখেত, অনেক দূরে অস্পষ্ট বাড়িঘরের উঁচু ভিটের চিহ্ন বোঝা যায়। ওই খানার ভেতরে গিয়ে লুকোতে হবে।

শুয়ে শুয়ে ওইসব দেখতে মন্টুর ভয় লাগছিল আরো বেশি। কিন্তু—হয়তো অন্য রকম বলেই কী রকম ভালোও লাগছিল। তারপর কখন এক সময় সে ঘুমিয়েও পড়েছে।

ঘুম ভাঙল কী একটা গোলমালে। যেন মনে হলো অনেক রাত হয়েছে। তাহলে কি এখনি উঠতে হবে। গিয়ে লুকোতে হবে খানার ভেতরে? মন্টু দেখল ফিরোজা আর টুটু আগেই উঠে পড়েছে, ওদের চোখে-মুখে আতঙ্ক; আম্মার চোখে পানি আর ভয় আর উদ্বেগ; ঘরের এক কোনায় দাদি জায়নামাজের ওপরে দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্তে সবটা ছবি মনে হলো আশ্চর্য বিদেশি—এমন ছবি মন্টু যা জীবনে দেখেনি। ‘আগুন!’ এই শব্দটাই যেন তার ভেতরে ভয়ের একটা শিখা ধরিয়ে দিল। ঘরে দাদা আর পাশের বাড়ির তিনকা চাচা আতঙ্কিতভাবে কথা বলছেন। বাইরে, দরোজা-বন্ধ-করা বাইরে কিছু উত্তেজিত

কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। দাদা আর তিনকা চাচা কী পরামর্শ করে একটু দরোজা খুললেন। খুলতেই কয়েকটি উত্তেজিতে উষ্ণ গলা। তারপর একদিকে উগ্র উত্তেজিত উক্তি, আর একপক্ষে কাতর আকুল আবেদন।

একবার দাদা বাইরে থেকে ভেতরে এসে কী রকম বিপর্যস্ত মাথা খারাপের মতো ভেতরে তাঁদের ঘরের দিকে যাচ্ছেন যখন, আম্মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সজল ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা হলো, আব্বা?' দাদা ফিসফিস গলায় কী-বলতে আম্মার চোখ-মুখ একটু উজ্জ্বল হলো। আম্মাও ফিসফিস করে বলছেন, 'মা বলে—এখন আর ভাবতেছেন কেন—জানে বাঁচলি সব হবে।' দাদিও কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, জায়নামাজটা তখনো বিছানো ছিল। দাদা তাঁর ঘরে গিয়ে দ্রুত ফিরে এলেন কী যেন হাতে মুঠো করে নিয়ে। তারপর দরোজায় দাঁড়িয়ে আবার কিছুক্ষণ কথাবার্তা।

দরোজার বাইরে দেখা গেল দু-তিনজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

তিন

নৌকা ভেসে যায়। দিনভর চলেছে। রাত্রিভর চলেছে। নদীর পর নদী খুলে যাচ্ছে, যেন জট-পাকানো রুপালি সিল্কের ফিতে। কী সুন্দর সুন্দর সব নাম। ভাগ্যিস আকাশ পরিষ্কার, বৃষ্টিবাদলা নেই। এর ওপর যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নামত, তাহলে তো আর খারাবির সীমা থাকত না।

পাশ দিয়ে যখন কোনো নৌকো যায়, ধক করে ওঠে বুক, বুকের ভেতরে গাঢ় নিশ্বাসহীনতা নিয়ে বসে থাকে ওরা। দিনের পর দিন এ রকম। ভিন্ গাঁ, ভিন্ জায়গা। তবু ঘুরে ঘুরে

যেন মন্টুদের নৌকোটা একটা সবুজরঙা ছবির ভেতরে ক্রমাগত পাক খেয়ে যাচ্ছে। ক্বচিৎ দু-একটা কালো নৌকো দরকার-নেই এমন মন্থর উদাসীনতার ভেতর দিয়ে চলে যায়। অচেনা মাঝিতে মাঝিতে চেঁচিয়ে কথা হয়—পরস্পর সম্পর্কে শান্ত কৌতূহল। সেই নদীর একেবারে গা ঘেঁষে স্বপ্নের মতো বাড়ি, গা ধুচ্ছে বউ, ছেলেরা হইচই করছে—ও রকম দৃশ্য অবশ্য ক্বচিৎ, দু-একবার জ্বলে উঠে মানুষের ঘরবাড়ি জীবনযাপন সম্পর্কে তপ্ততম আগ্রহ জ্বালিয়ে দিয়ে নিভে যায়। বেশির ভাগ সময় নৌকো চলেছে মৃত জনহীন প্রাকৃতিক সবুজের মধ্য দিয়ে কেটে কেটে। সবুজ, নীল আর রুপালির মধ্যে কালো একটা বিন্দু রেখায় রূপান্তরিত হয়ে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যায়।

নৌকো ভেসে চলে। সন্ধে হয়ে আসে নদীর ওপর। এ রকম আকাশ থেকে সন্ধে নামা মন্টু জীবনে দেখেনি। সমস্ত ভুলে গিয়ে ছইয়ের বাইরে এসে ছইয়ে হেলান দিয়ে সে দেখে কালো রং কী করে বৃষ্টির মতো নেমে আসছে, সেই কালো রঙের বৃষ্টি কী করে ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে, অনন্তে তার নীলাভ স্বপ্নময় বড় বড় চোখ দুটি জুড়িয়ে যায়।

মাঝি বলে, 'তোজু, এট্টু জোরে বেয়ে চল্। সামনেই আল্লারাখার চর।' তারপর নরম গলায় বলে, 'খোকাবাবু, তুমি এট্টু ছইয়ের ভেতরে গে বসো, জায়গাটা ভালো না, আল্লা আল্লা করে পার হয়ে যাই।'

মন্টুকে পাঁচ-সাতজন ডাকাতের মতো এসে ঘিরে ধরে অন্ধকার।

চার

শবে-বরাতের সন্ধেবেলা।

দহলিজঘর, ভেতরের উঁচু মাটির বারান্দা, মাটির ঘর, পাকা ঘর, রান্নাঘর—সারা বাড়ি ওরা লাল-নীল-সবুজ রঙের মোমবাতি জ্বেলে আলো করে রেখেছে। কাজি-বাড়ি থেকে খাঞ্চা ভরে এখনি এল নানা রকম সুস্বাদু রঙিন হালুয়া। হইচই।

মন্টুদের বাড়ির সামনের খেলার মাঠে কে একজন দুষ্টুমি করে একটা কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। ফুলঝুরিটা পড়পড় করে আগুনের শাদা শাদা তারা ফোটাতে শুরু করেছে; আর কুকুরটা কিছু বুঝতে না-পেরে প্রাণভয়ে পাগলের মতো দৌড় দিয়েছে যেকোনো একদিকে। কিন্তু যেদিকেই যায় লোকজন তাড়া করে ফিরিয়ে দিচ্ছে মাঠের ভেতরেই, সারা মাঠময় হুল্লোড়, হাসি, হইচই। ছোট ছেলেমেয়েদের খুশি দ্যাখে কে। বড়রাও প্রাণভরে হা-হা করে হাসছে।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল মন্টু। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে-ও মজা পায়, হাসেও। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথাও খারাপ লাগে তার, এতটা মশকরা ঠিক যেন সহ্য হয় না। যেন মনে হয় একটু মমতাহীন, হৃদয়হীন, বিদ্রুপময়। একটা বিমর্ষতা নিয়ে হুল্লোড়ে ভিড়ের মধ্যে একগুচ্ছ হাঁসের ভেতরে একটা বোকা বকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রোকেয়া, তার খালাতো বোন, কদিন আগে ওদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল মন্টু, আদর করে বাজারের দোকান থেকে একটা দেশলাই কিনে দিয়েছে মন্টুকে। খেলনা দেশলাই। কিছু না। হলদে আলোর জায়গায় দেশলাইটা জ্বাললে লাল আলো জ্বলে ওঠে। কী মনে করে হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে মন্টু লাল রঙের ব্যক্তিগত আগুন জ্বেলে দ্যায়!

পাঁচ

নৌকো ভেসে যায়।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবিরল একই দৃশ্যের পরম্পরা দেখতে দেখতে চোখ ধরে আসে। দুদিনের দিন ছ্যাঁৎ করে ওঠে মন্টুর বুক বাইরের দিকে তাকিয়ে। ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। দাদা বুড়োমানুষ। তাই বলে সে তো বুড়ো না, হতে পারে ছোট ছেলে। কিন্তু এখন, গত কয়েক মাসে, যেন তার বয়েস অনেক গুণে বেড়ে গেছে। আমূল শিউরে উঠে বালক কিশোর মন্টু বলে, ‘এ কী! মাঝি! নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছ তুমি। কাল সন্ধেবেলাও তো এখেন দিয়ে গেছি আমরা। দ্যাখো, পানির ধারে বাঁকের মুখের ঝুঁকে-থাকা সেই বটগাছটা। ওই যে সেই চাকতিটা ডালে ঝুলে আছে। কালই বললাম না আমি, হঠাৎ এখানে এই লোহার চাকতি ঝুলিয়ে দিল কে?’

মাঝি কোনো কথা বলে না। ফিরোজা ভয়ে চমকে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন। অভিভূত দাদার কাণ্ডে বিপর্যস্ত মা-ও, বলেন, ‘বলিস কী রে!’

দাদার মুখ-চোখ খানিকটা অপরাধবোধে, খানিকটা আশ্চর্যে, খানিকটা ভীতিতে মাখামাখি হয়ে গিয়ে মুহূর্তে একদম আলাদা হয়ে যায়। বলেন, ‘কী ব্যাপার মাঝি? কতা বলতোসো না কেন?’

বুড়ো মাঝি আমতা আমতা করে, ‘আমারো কেমন যেন সন্দ হচ্ছিল। এত দেরি হবার কথা না তো! পাকিস্তানে কখন পৌঁছে যেতুম। দেবহাঁটা তো এখেন থেকে বেশি দূর হবার কতা না।’ তারপর চেঁচিয়ে বলে, ‘কোতায় এলুম রে তোজু?’

তোজু ছোকরা মানুষ, নৌকোর উল্টো দিকের গলুই থেকে দাঁড় বাইতে বাইতে জবাব দ্যায়, ‘আমি কী জানি! আমি তো এ পতে আসিনি আর। তুমি যেদিক নে যাচ্ছ। কোনো দিশামিশা পাই না তোমার।’

‘এট্টু, সবুর কর দিনি। ড্যাঙায় নামার দরকার নেই,

মাঝনদীতেই দাঁড়াই। এট্টু ভেবে নেই। এ্যাখুন মনে হচ্ছে ঐ যে আগে বাঁয়ে ছোট নদীটা ফেলে এলুম, ওখেন দিয়েই পার হতে হবে।’

মন্টুরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। দাদার ওপর রাগও হতে থাকে মন্টুর। কী একটা আনাড়ি মাঝি নিয়েছে! কিন্তু...এখন কি রাগ-অভিমানের সময়...।

ছয়

কলকাতা থেকে আব্বা এসেছেন। মন্টু-টুটুদের জন্য এনেছেন কাপড়-জামা, ফল-টল। ফিরোজা বাকশো খুলে বের করে দিচ্ছিল। সবার মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত, হাসিতে উজ্জ্বল। বাকশো থেকে হঠাৎ লাল-শাদা একটা জারসি বেরিয়ে পড়ে। ওমা, এটা কী! সবাই অবাক!

মা ওদের বুঝিয়ে দ্যান। বলেন, ‘তোদের আব্বা তো ভালো ফুটবলও খেলতেন এক সময়। মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে নাম শুনিচিস না?—ওদের দলে খেলতেন। একবার ঢাকা আর চট্টগ্রামেও গিয়েছিলেন খেলতে। মন্টুর মতন বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবার লোক না তোদের বাপ...মন্টুটা যে কোত্থেকে হলো ওরাম...’

সাত

ছোট নদী থেকে বড় নদীতে বাঁক ঘুরতে গিয়ে নৌকো প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। তখন রাত্রি। কালো জলের উচ্ছ্বাস। কোত্থেকে যে এত জোয়ারের ধারা এসে পড়েছে!

মাঝি আল্লা আল্লা করে ওঠে, ‘এ সময় কোত্থেকে এই পাহাড়-পর্বত নেমে এল। এ্যাখুন তো গোনের সময় না। হায় আল্লা!’

কালো উত্তাল তরঙ্গ খেপে খেপে ওঠে। ছোট নদী থেকে বড় নদীতে যতবারই পড়তে চায়, ততবারই নৌকো যায় বেঁকে, ততবারই আছড়ে ফেলতে চায় প্রাণপণ শক্তিতে। জোয়ারের জলের সঙ্গে নৌকোর গতির তাল মেলাতে অনেক-অনেকক্ষণ লেগে যায়। যখন শেষ পর্যন্ত এই অসামান্য ঘটনাটি সম্পন্ন হলো, মাঝি দুজনও ঘেমে-নেয়ে যেন গোসল করে উঠেছে।

আট

অলি মামুদ নানা বললেন, ‘ইট দুটো মাথায় নে দাঁড়িয়ে থাক, হারামজাদা।’ তাঁর মুদিদোকানের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে হেলাল—অলি মামুদ নানারই সতেরো সন্তানের একটি। নানা দোকানে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করছেন ঠান্ডা মাথাতেই, যেন কিছুই হয়নি এম্নিভাবে। এদিকে দরদর করে ঘাম ছুটছে হেলালের, চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে, হাত দুটো কনকন করছে ছিঁড়ে পড়ার মতো, যে হাতে সে ইট দুটো ধরে আছে মাথায়। গনগনে রোদে পায়ের তলার মাটি আগুন হয়ে গেছে, পা রাখাই দায়।

দোকানের সামনে নানার ভয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মন্টু ভয়ে ভয়ে দুবার দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা

করল—নানা হয়তো ডাক দিয়েই ধমকে দেবেন—ভাগ্যিস খেয়াল করেননি ছেলে-ছোকরারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার লোকেও যাবার সময় একটু থেমে দেখে যাচ্ছে এক পলক।

কারো সাহস নেই যে প্রতিবাদ করে। দু-একজন প্রতিবাদ করতে গিয়ে সাংঘাতিক রকম ঝগড়ার ব্যাপার হয়ে গেছে। অলি মামুদ নানা তাদের এই মারে তো ওই মারে অবস্থা। একবার, কিছু না, নানার দোকানের সামনে দিয়ে একটা ছোকরা গান গেয়ে যাচ্ছিল। অলি মামুদ নানা তাকে ধরে বেদম মারেন গলা ছেড়ে গান গাওয়ার জন্যে—এই নিয়ে গ্রামময় হইচই পড়ে গিয়েছিল।

এখন, হেলাল, দুপুরবেলার তীব্রতম রোদে দাঁড়িয়ে থেকে, রাস্তার ধারে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় নিঃশব্দে।

নয়

দাদির সঙ্গে ফুফুর বাড়িতে যাচ্ছিল মন্টু গোরুর গাড়িতে চড়ে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে সমস্ত অঞ্চল ভরে যায়। কাঁচা রাস্তার ভেতর দিয়ে গোরুর গাড়ির চাকা চলে গিয়ে তৈরি হয়ে গেছে একটি আবহমান রেখা। ভাঙা, পরিত্যক্ত মসজিদের পাশ দিয়ে, তরমুজখেতের ধার দিয়ে, পুকুর বাড়ি আমগাছ জামগাছ কলাগাছের পাশ দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। যেতে যেতে মন্টু শখ করে নেমে পড়ে একবার, গোরুর গাড়ির পাশে পাশে কাঁচা শাদা ধুলো-ওড়া দুপুরবেলার বিজন রাস্তায় হেঁটে চলে। একটা আমবাগানের ভেতরে ঘুঘুর ডাক দুপুরটাকে বানিয়ে দিচ্ছিল গেরুয়া-পরা বাউল।

ফুফুর বাড়ি আরো গ্রামের ভেতরে। সম্পন্ন গৃহস্থ। ফুফা এক দাড়িঅলা বিশাল পুরুষ। আগে একটা বিয়ে করেছিলেন, মারা গেছে সে বউ, পরে বিয়ে করেন মন্টুর ফুফুকে। মাঝে মাঝে

ওঁদের বাড়িতে গেলে অদ্ভুত ভালো লাগে। বাড়ির ভেতরে বিরাট উঠোন, দু-তিনটে বিরাট বিরাট ধানের গোলা, একপাশে ঢেঁকিতে পাড় পড়ছে সারা দিনই—কাজ করছে জনরা, দুপুরবেলা ফিরছে খেত থেকে, বাড়ি জমজমাট, সবার রান্না হয় বাড়িতেই। রোদ হেলে আসতেই আবার ওরা খেতে চলে যাচ্ছে। বড় ভালো লাগে মন্টুর। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে ফুফার শোবার ঘর। পাকা বাড়ি, বড় জানালা, জানালার ওপরে লাল-নীল-সবুজ শার্শিকাচ। ঘরের ভেতরটা পুকুরে ডুব দিলে যে-ঠান্ডা সবুজ শান্ত আভা দেখা দ্যায়, সে রকম। দেয়ালে হরিণের মাথা—শিঙের ডালপালাসমেত। আর ফুফা দাড়িঅলা বিশাল সম্পন্ন পুরুষ—সদাহাস্যময়, স্বাস্থ্যবান, সবল।

দশ

খালের দুপাশে রাস্তা। খালের ওপরে পোল। একপাশে বড় বড় দেবদারু, শালগাছ। আর একদিকে জনপদ-দোকানপাট, মাঝে মাঝে খালের দিকটা ফাঁকা, মাঝে মাঝে খালের ওপরেই হোটেল ও অন্যান্য দোকানপাট।

একটা ঝাউগাছের নিচে মন্টুদের নৌকোটা থামে। দাদা উঠে নেমে যান। গেছেন তো গেছেনই, এদের আর সবুর সয় না, মন্টু খালপাড়ে নেমে পায়চারি করে। খানিকক্ষণ পরে দাদা ফিরে আসেন—ওবায়েদ মামা-সমেত।

তারপর রিকশা ডাকাডাকি, একটা ছোট বাড়িতে যাওয়া, জোঁক-ভরা ডোবার মতো ছোট্ট পুকুরে স্নান, অমৃতের মতো ভাত। খাওয়াদাওয়া করতে করতেই প্রসঙ্গ ওঠে, ‘এখেনে একটা বাড়ি আছে, হিন্দুর বাড়ি, বিনিময় করতে চান যদি—অনেকটা আপনাদের মতোই’। ‘চলো চলো, অনেক হয়েছে—আর না,

ঢের শিক্ষা হয়েছে, এর পরে জানে মরতে হবে, বিকেলবেলাই চলো দেখে আসি, মোটামুটিও যদি পছন্দ হয়, দরাদরিতে বনে, নে নেবো—এদের আর কারো ইচ্ছে না, আমারও না—'। উঁচু বারান্দায় মাদুর পেতে শোয়া কী আরামের, বারান্দার দেয়ালে বাড়ির ছেলেমেয়েদের বাঁধানো ফটো টাঙানো রয়েছে। দেখতে দেখতে চোখ জড়িয়ে যায়—তিন দিন তিন রাত্রির নৌকো ভ্রমণের ক্লান্তিতে, তার সদ্যজাগ্রত মনের ওপর বহু বিচিত্র কোণ থেকে যে চাপ এসে পড়ছে তাতে।

এগারো

গরমের দিন। লাল মেঝেয় পড়ে ঘুমোয় মন্টু। পাশা-আঁকা লাল মেঝে। বিশাল নিচু জানালা। তার পৈঠা এত বড় যে দিব্যি ঘুমানো যায়। ওদিকে লেবুগাছ, হাওয়া উঠলে সুগন্ধি বাতাস ভেসে আসে। স্বপ্নের মতো লাগে। বাগানে পাখিরা ডাকে। বাইরে একটা মস্ত শান-বাঁধানো পুকুর আছে। ভেতরেও একটা ডোবামতো—কাটানো চলছিল, সেই অবস্থায় স্থগিত হয়ে যায়। পেছনে ধানখেত। ধানখেতের মধ্যেও বিরাট একটা আমগাছ। তার ওপাশে বেড়া—চাষিদের বাড়ি, ওদের উঠোন, ধানের গোলা, ঢেঁকিঘর—এই সব চোখে পড়ে। কবে কোন দুপুরবেলায় এইখানে মেঝের ওপর পাশার ছক পেতে খেলা হতো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যেত। এখন সেখানে গড়াগড়ি যায় মন্টু। ঘুমের ভেতরে তার মনে হয় ঘরটা একটু একটু দুলছে, দুপাশে পাড়, পানির ছলছলানি, দুদিকে পাড়াগাঁর সবুজ, একটু একটু দুলছে, নৌকোর মতো। হয়তো দুঃস্বপ্ন দ্যাখে, সাঁই সাঁই করে নৌকো চলে আসছে জলের ওপর দিয়ে, হয়তো স্বপ্ন দ্যাখে কেবলি ভেসে যাওয়ার। ঘুমের মধ্যে নৌকো দোলে। ঘুমের ভেতর নৌকো চলে